কৈবর্ত বিদ্রোহ –
বাংলা অঞ্চলের মানুষ ইতিহাসের নানা সময়েই সোচ্চার থেকেছে শাসকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে। গড়ে তুলেছে প্রতিবাদ-বিদ্রোহ। কখনো সফল হয়েছে, কখনো হয়নি। তবে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে প্রথম সফল জনবিদ্রোহের ঘটনা খুঁজতে গেলে চলে আসে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে যাওয়া কৈবর্ত বিদ্রোহের নাম। যদিও কৈবর্ত বিদ্রোহ শুধুই জনবিদ্রোহ ছিল না, বরং তাতে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন সামন্তদের একটি বড় অংশ। তারপরেও বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ একটি জনবিদ্রোহ হিসেবেই ঐতিহাসিক মাত্রা যোগ করেছে। কৈবর্ত বিদ্রোহকে বরেন্দ্র বিদ্রোহ নামেও অভিহিত করা হয়।

কৈবর্তদের পরিচয়-
অনেকে মনে করেন কৈবর্ত শব্দটি এসেছে "ক" (পানি) এবং "বর্ত" (জীবনযাপন) শব্দদ্বয় থেকে। যেহেতু কৈবর্তরা ছিল জেলে সম্প্রদায়, এবং তাদের জীবনযাপন ছিল পানিকেন্দ্রিক। তবে এর ভিন্নমতও আছে। যেমন- অধ্যাপক লাসেন বলেছেন, "কৈবর্ত শব্দটি মূলত এসেছে কিম্বর্ত শব্দ থেকে যার অর্থ নিচু পেশার মানুষ।" তবে কৈবর্তদের পেশা কেবল মাছ ধরাই ছিল না। আরেক ধরনের কৈবর্তদের কথাও শোনা যায়, যাদের ডাকা হত হেলে। হেলেরা ছিল কৃষক সম্প্রদায়। তবে বরেন্দ্র অঞ্চলের বসবাসকৃত অধিকাংশ মানুষই ছিল জেলে এবং কৃষক এই দুই সম্প্রদায়ের।

বরেন্দ্র অঞ্চলের মানুষগুলো পরিচিত ছিল শান্ত ও নিরীহ জনগোষ্ঠীর মানুষ হিসেবে। এমনিতে তৎকালীন সময়ে সামাজিকভাবে কৈবর্তদের স্থান ছিল নিচে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরাণে কৈবর্তদের বলা হইয়াছে অব্রহ্মণ্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি বহির্ভূত।" কাজেই তৎকালীন সমাজে তারা এমনিতেই ছিল বৈষম্যের শিকার। কিন্তু কী এমন ঘটেছিল যে, বরেন্দ্র অঞ্চলের এই জেলেরা কয়েকশত বছরের পুরোনো পাল সাম্রাজের বিরুদ্ধে গড়ে তুলল প্রবল প্রতিরোধ? আর তার ধাক্কায় চূর্ণ হয়ে গেল পালদের গৌরব? চলুন তবে জানি সেই কাহিনী।

কৈবর্ত বিদ্রোহ শুরুর প্রেক্ষাপট-
প্রথমেই বলে রাখি, কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে খুব বেশি প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক দলীল বিদ্যমান নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা 'রামচরিত'-কে বলা যায় একটিমাত্র গ্রন্থ, যাতে এই কৈবর্ত বিদ্রোহের সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা আছে। যদিও ঐতিহাসিকগণ এই গ্রন্থের মধ্যে অতিরঞ্জন এবং পক্ষপাতিত্বতের অভিযোগ আনেন, তারপরেও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলীল হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে এই গ্রন্থটি।

যা-ই হোক, সুদীর্ঘ চারশো বছর প্রাচীন বাংলা অঞ্চলের রাজ্যশাসনে ভূমিকা রেখেছে পালরা। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে শত বছরের রাজনৈতিক গোলযোগ আর অরাজকতাপূর্ণ সময়ের অবসানকল্পে এই অঞ্চলের মানুষ কিংবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ গোপালকে নির্বাচিত করেছিলেন নিজেদের রাজা। আর সেই থেকে উত্থান ঘটে পালবংশের। আর এই বংশের বাতি জ্বলেছিল সুদীর্ঘ চারশো বছর। পালদের চারশো বছর রাজত্বের প্রায় শেষের দিকে এসে মুখোমুখি হতে হয় এই বরেন্দ্র বিদ্রোহের। এ সময় পাল বংশের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় মহীপাল, যার রাজত্বকাল ধারণা করা হয় ১০৭৫ সাল থেকে ১০৮০ সালের মধ্যে।

পেছন ফিরতে গেলে দেখা যায়, ষষ্ঠ পাল রাজা বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপালের সময় থেকেই পাল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। নারায়ণপাল ৯০৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে পরলোকগমণ করেন। তার মৃত্যুর পর মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব কিছুটা ফিরিয়ে আনলেও তার মৃত্যুর সাথে সাথেই আবারো পালদের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পাল রাজা দ্বিতীয় মহীপালের শাসনামলে। দ্বিতীয় মহীপালের ঘরে-বাইরে তখন রাজকীয় চক্রান্তের জাল। নানা কারণে জনসাধারণের মধ্যে চলছিল তীব্র অসন্তোষ।

প্রথমত, দ্বিতীয় মহীপাল প্রজাদের অসন্তোষ দূর করতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজ প্রাসাদের ষড়যন্ত্রও মোকাবেলা করতে সমর্থ হননি। এরই মধ্যে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে কিংবা কুচক্রীদের পরামর্শে তিনি তার অপর দুই ভাই শূরপাল এবং রামপালকে কারারুদ্ধ করেন। সামন্তদের মধ্যে তার অপর দুই ভাইয়ের একটি প্রভাব থাকা স্বাভাবিক ছিল। আর খুব সম্ভব এ প্রভাবের ফলেই বরেন্দ্র এবং অন্যান্য অঞ্চলের সামন্তদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে দ্বিতীয় মহিপালের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যান।

কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে মনে করা হয় ধর্মীয় কারণকে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের।তারা তাদের কথিত অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী এবং জীবহত্যার বিরোধী ছিলেন। যদিও যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে মানুষ হত্যায় এসব নীতির বালাই ছিল না, তবে অন্যান্য প্রাণী হত্যার ক্ষেত্রে তারা অহিংস নীতির ব্যত্যয় পছন্দ করতেন না বলেই প্রতীয়মান হয়।

কৈবর্তরা জেলে হওয়ায় মাছ ধরাই ছিল প্রধান পেশা। তবে শুধু কৈবর্তরা নন, বরং বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাসকারীরা অধিকাংশ মানুষই মৎস্যভোজী ছিল। দ্বিতীয় মহীপালের সময় জীবহত্যার ধূয়া তুলে তাদের এই পেশাকে নিরুৎসাহিত এবং বাধাগ্রস্থ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে নেমে আসে কঠোর শাস্তি। এসব কারণের সাথে মহীপাল তার রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। কাজেই এই অঞ্চলের মানুষের অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে সময় লাগেনি।

কৈবর্ত বিদ্রোহ: বাংলা অঞ্চলের সফল জনবিদ্রোহ –
কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দিব্যক বা দিব্য। তিনি খুব সম্ভব প্রথমদিকে পালদের একজন রাজ কর্মচারী কিংবা সামন্ত ছিলেন। তিনি কৈবর্তদের একত্রিত করে একটি শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করেন। অনেক সামন্তও তাকে সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানা যায়। দ্বিতীয় মহীপাল দিব্যের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হন। এতে গৌড় রাজধানী ও বরেন্দ্র দিব্যের হস্তগত হয়। দিব্য এ অঞ্চলে গঠন করলেন একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের। ধারণা করা হয়, দিব্যের সাথে যুদ্ধ হয়েছিল বর্মণরাজা জাতবর্মারও। কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি বর্মণরাজ। অতঃপর বাংলা অঞ্চলের প্রথম সফল জনবিদ্রোহের ফসল হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নেয় বরেন্দ্র, কৈবর্তদের একটি স্বাধীন অঞ্চল হিসেবে!

দিব্যের পর তার ভাই রুদ্দোক ও তারপর দিব্যের ভ্রাতুস্পুত্র ভীম বরেন্দ্র শাসন করেন। তারা তিনজনই প্রজাদরদী সুশাসক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। আর এই জনপ্রিয়তা পালদের আরো শংকিত করে তুলেছিল।

পালদের বরেন্দ্র পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা
কৈবর্ত বিদ্রোহে রাজা দ্বিতীয় মহীপাল তার প্রাণ খোয়ালে কারাগারে বন্দী তার দুই ভাই এর অব্যবহিত পরেই মুক্তিলাভ করেন এবং দ্বিতীয় শুরপাল সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় শুরপাল সম্পর্কে সন্ধ্যাকর নন্দী একেবারেই নীরবতা পালন করেছেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে তার সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। অপর ভাই রামপাল দ্বিতীয় শুরপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। তখন বরেন্দ্র অঞ্চলে কৈবর্ত শাসন বিদ্যমান।

রামপাল প্রথমদিকে বরেন্দ্র অধিকার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপর বেশ কিছু সময় তিনি নিশ্চুপ থাকার পর শক্তি সঞ্চারে নেমে পড়েন। এরই মধ্যে দিব্য তার রাজ্য আক্রমণ করলে সামনে সম্মুখ বিপদ দেখতে পেয়ে সকল রাজকীয় সম্মান ভুলে, নিজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সামন্তদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকেন। প্রচুর সম্পদ ও ভূমি প্রদান করার মাধ্যমে তিনি রাঢ়, অঙ্গ, মগধাদি, আটবিক ইত্যাদি প্রদেশের সামন্তদের সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হন। বরেন্দ্র থেকে উৎসাহিত হয়ে এই বিদ্রোহ মগধেও ছড়িয়ে পড়লে রামপাল বিদ্রোহী নেতা দেবরক্ষিতকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজ কন্যার সাথে বিয়ে দিয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন।

রামপাল তার নানাবিধ প্রচেষ্টায় অবশেষে বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটাতে সমর্থ হন। তারপর প্রথমে মাতুলপুত্র শিবরাজকে বরেন্দ্র অভিযানে পাঠান। শিবরাজ গঙ্গা পার হয়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। এরপর রামপাল তার বিশাল বাহিনী নিয়ে নদী পার হয়ে আক্রমণ করেন বরেন্দ্র।

ভীম ও রামপালের যুদ্ধ-
বরেন্দ্র তখন শাসন করছেন দিব্যের ভ্রাতুস্পুত্র ভীম। যদিও রামপাল তার বিশাল বাহিনী নিয়ে বরেন্দ্র আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু ভীমও কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি প্রচন্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। কিন্তু হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধরত অবস্থায় হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে ভীম বন্দী হয়ে গেলে ভীমের বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তবে এসময় এগিয়ে আসেন ভীমের বন্ধু হরি। তিনি বিশৃঙ্খল সেনাদের আবারও একত্রিত করে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু রামপাল ছিলেন ভীষণ ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি প্রচুর অর্থের প্রলোভনে হরিকেও যুদ্ধক্ষেত্রেই বশে আনেন। অর্থের লোভে হরি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ালে বিজয়ী হন রামপাল। বন্দী ভীমসহ তার পরিবারের সদস্যদের সবাইকে হত্যা করা হয়। আর এর মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে বরেন্দ্র বিদ্রোহের।

দিব্যক স্মৃতিস্তম্ভ:
একটি জনবিদ্রোহের স্মারক
বরেন্দ্র বিদ্রোহের পর এ বিদ্রোহের সাথে জড়িতদের করুণ পরিণতি সত্ত্বেও এই জনবিদ্রোহের কিছু স্মৃতিচিহ্ন অমর হয়ে আছে আজও। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিব্যক স্মৃতিস্তম্ভ। এর অবস্থান বর্তমান নওগাঁর পত্নীতলায়। একটি সুবিশাল দীঘির মাঝখানে গ্রানাইটের স্তম্ভটি নির্মাণ করেছিলেন দিব্য নিজে কিংবা তার উত্তরাধিকারী রুদ্দোক অথবা ভীম। পালদের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রবাসীর বিজয়ের স্মৃতি ধরে রাখতে নির্মিত স্তম্ভটি আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে স্বহিমায়।